দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 15 JAN 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৩

ঘরে-বাইরে

— সন্ধানী

গত শুক্রবার একই পত্রিকায় পাশাপাশি তিনটি রিপোর্ট ছাপা হয়েছে। রিপোর্ট তিনটির শিরোনাম হচ্ছে, 'সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু।' 'কিণ্ডার গার্টেনের তিন লাখ শিশু নানা মানসিক সমস্যার শিকার'। এবং 'পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব থেকে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিও না।' শেষ বক্তব্যটি প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রীর। ছাত্র লীগের ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সম্মেলনে তিনি এ উপদেশ দেন। সভানেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করার জোর দাবী জানিয়ে বলেন, 'শিক্ষা ছাড়া প্রগতি ও সমৃদ্ধি কোনটাই সম্ভব নয়। সম্ভব নয় জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা জাতীয় জীবনে বিশেষ কোন অবদান রাখা।' তার মতে, শিক্ষা জীবনের আশি ভাগ সমস্যা দূর করে বলেই এর পরিবেশ নির্মল হওয়া প্রয়োজন। অপর দু'টি সংবাদ উপদেশ মূলক নয়। শিক্ষার বিচিত্র সমস্যা সম্পর্কিত। অবশ্য আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর উপদেশমূলক বক্তব্যে শিক্ষা সমস্যার কোন ইঙ্গিত নেই তা-ও নয়। বর্তমানে শিক্ষা ক্ষেত্রে সবচে বড় সমস্যা হচ্ছে পরিবেশের অভাব। এই পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী অবাঞ্ছিত সন্ত্রাসী তৎপরতা। বিষয়টি তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করতে ভুল করেননি, তবু বাহ্যতঃ খবর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন। শিরোনামও অভিন্ন নয়। এরপরও তিনটি খবরের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার মত একটি সাদৃশ্য বহমান। তাহলো, শিক্ষা ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। নানা সমস্যা ছাড়াও সমাজ জীবনের সাথে এক ধরনের সামঞ্জস্যহীনতা বর্তমান। ক্ষেত্রভেদে শিক্ষার মান কিছুটা উন্নত হলেও সমাজের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ নয়। নীচু স্তরে শিক্ষার সাথে উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার মিল নেই। ফলে শিক্ষার্থীদের জীবনে সৃষ্টি হয় তেলে-জলে অবস্থা, কিণ্ডার-গার্টেন ও তৎ-পরবর্তী শিক্ষা এর প্রমাণ। কিণ্ডার গার্টেনে শিক্ষার পরিবেশ ও মান তুলনামূলকভাবে উন্নত। ফলে শুরুটা ভাল হয়। কিন্তু তৎ-পরবর্তী জীবনে উহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফলে কিণ্ডার গার্টেন স্তর অতিক্রম করার পরই শুরু হয় মানসিক সংঘাত। যে পরিবেশে কিণ্ডার গার্টেনে শিক্ষা জীবন শুরু করা হয় পরবর্তী জীবনে তা না পাওয়াই এর মূল। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে ভাল রেজাল্ট করাও দুরূহ হয়ে পড়ে।

শিক্ষা সংকট সভ্যতার সংকটের প্রস্তুতি। শিক্ষা ছাড়া মানুষ যথার্থ মানুষ হতে পারে না। পশ্চিমের দেশগুলোতে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ উন্নতির মস্ত বড় একটি উপাদান। কিন্তু এর বিকাশ শুরু হয় কখন? খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, যখন থেকে শিক্ষা আরম্ভ হয় তখন। সে সময় থেকেই মানুষ বুঝতে আরম্ভ করে যে, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের খেয়ালের বস্তু নয়। উহাকে খেয়ালের বস্তু মনে করা হলে প্রগতি ত্বরান্বিত হয় না। উল্টো নানা বিশৃঙ্খলা ও বিবাদ সামনে চলার গতি মন্থর করে দেয়। জন্ম নেয় নানা কু-সংস্কার। রবীন্দ্রনাথ তাই অর্ধ-শতাব্দি আগে বলে গেছেন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দাও। দুর্ভাগ্য ও কু-সংস্কারের আঁধার কেটে যাবে। এই শিক্ষার আলো জ্বালানোর সদিচ্ছা ব্যক্ত করা হয়নি, এমন কোন সরকার কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অন্ততঃ আমাদের জানা নেই। সব সরকারই শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ ক্ষেত্রে আন্তরিকতা প্রমাণ করার জন্য শিক্ষা খাতে অধিক বরাদ্দের বিষয় তুলে ধরতেও কার্পণ্য করা হয়নি। কিন্তু এরপরও সবসময়ই একটি প্রশ্ন থেকে গেছে। তাহলো, বাড়তি ব্যয় প্রয়োজনানুগ বা শিক্ষার যথার্থ উন্নতির সহায়ক কিনা। কারণ, কোন কিছু যদি ন্যূনতম প্রয়োজনের অধিক না হয় তাহলে তাকে বাড়তি বলে গণ্য করা যায় না। সহজে বোঝার জন্য একটি উদাহরণ দেই, আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী একজন লোকের জন্য দৈনিক সাড়ে ১৬ আউন্স চাল দরকার। যদি এর অধিক পাওয়া যায় তাহলেই তাকে বাড়তি বলা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার বেশীর ভাগ এর অর্ধেকও পায় না, একটা বিরাট অংশকে এক-চতুর্থাংশ সম্বল করে দিন কাটাতে হয়। আগামী বছরগুলোতে এর সমাধান হবে এমন কোন ভরসাও নেই। বর্তমানে খাদ্য ঘাটতি, জাতিসংঘ ও বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর এক হিসাব অনুযায়ী ৪৬ লক্ষ টন। নগদে ও বাকীতে সরকারী ও বেসরকারীভাবে প্রায় ২৪ লক্ষ টন আমদানী করার পরও ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ২০/২২ লক্ষ টন। আপৎকালীন সময়ের জন্য যে খয়রাতি খাদ্য ভাণ্ডার ছিল তা-ও নানা খাতে বরাদ্দের ফলে নিঃশেষ প্রায়। স্বয়ং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রতিমন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী উক্ত ভাণ্ডারে মজুত আছে মাত্র হাজার টন। এই সময় নানা স্থান হতে পাওয়া যাচ্ছে চাষাবাদে সংকটের সংবাদ। কোথাও মূলধনের অভাবে চাষী চাষ করতে পারছে না। আবার কোথাও সারবীজ সংকট সৃষ্টি করছে। সারের মূল্য-বৃদ্ধি পরিস্থিতি আরও সংকটজনক করবে কিনা গবেষণাতেই তা বলা যায়। অথচ বর্ষ শেষে শোনা যায় উন্নতির গাল-ভরা দাবী। বলা হয়, প্রবৃদ্ধির হার গতবছরের তুলনায় বেশী। অর্থাৎ শতকরা ৪ ভাগের স্থলে ৫ ভাগ। এই প্রবৃদ্ধির দাবী যদি-বা-সত্যি হয় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনে দৈনিক সাড়ে ৪ বা ৫ আউন্স খাদ্যও নিশ্চিত করে না। এই অবস্থায় উন্নতির দাবী পরিহাস ছাড়া কিছু মনে হতে পারে কি? শিক্ষাখাতে অধিক বরাদ্দ এবং উন্নতির দাবীও প্রকৃতপক্ষে তাই। প্রতিবছর দু-চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে না নিশ্চয় তা নয়। ব্যক্তিগত ইমেজ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সৃষ্টি করার জন্যও কেউ কেউ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছেন। কিন্তু উহাকে কোন অবস্থাতেই বাড়তি জনসংখ্যানুপাতিক বলা যায় না। তাহলে ২৫ বছরে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠির হার শতকরা ৭৩ জন না হয়ে অনেক কম হতো। কিন্তু বাস্তবে নিছক নাম-সই জানা লোকসহ শিক্ষিতের হার এখনো শতকরা ২৭ জন, কোন কোন মহলের মতে ত্রিশ। বাকী ৭০/ ৭৩ জনই অক্ষরজ্ঞানহীন। এর একটি কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং অন্যটি দারিদ্র্য। উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব কতো গভীর ভর্তি মৌসুম এলে তা ঠাহর করা যায়। দেখা যায়, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেজায় ভিড়। বাইরে উদ্বেগাকুল অভিভাবক। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভিড় জনসভাকেও হার মানায়। বস্তুতঃ ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রায় মাসখানেক আগে থেকেই শুরু হয় অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা। ধরা-ধরি এবং বিভিন্ন পর্যায়ে চেষ্টা তদ্বির কতো যে করা হয় তার ইয়ত্তা নেই। এ যে শুধু প্রাথমিক বা স্কুল পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ঘটে তা নয়। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি এর চেয়ে খুব উন্নত নয়। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। শিক্ষা ক্ষেত্রে সব বিষয়ে সকলের সমান মেধা থাকে না। তাই কেউ শিক্ষাবিদ আবার কেউ বা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। বাংলাদেশে সে ইচ্ছা গ্রহণ করার উপায় নেই। নির্ভর করতে হয় ভাগ্যের উপর। কারণ, এ ক্ষেত্রেও পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রকট। অন্যদিকে আছে দারিদ্র্যের অভিশাপ। মূলতঃ আর্থিক সংকটের জন্যই বড় অংশটার পক্ষে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দোর গোড়ায় পৌঁছা সম্ভব হয় না। যাদের পক্ষে সম্ভব হয় এদেরও একটা মোটা অংশ পঞ্চম-শ্রেণী অতিক্রম করার আগে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত যারা টিকে থাকার সুযোগ পায় এরাও উপযুক্ত শিক্ষা পায় বলা যায় না। বি-এ, এম-এ পাস শিক্ষিতদের শিক্ষার মান এর নজীর। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বহু বি-এ, এম-এ পাস যুবক-যুবতী আজকাল তিন চার লাইন বাংলা-ইংরেজী কোনটাই শুদ্ধ করে লিখতে পারে না। এর জন্য শিক্ষার্থী সমাজকে একক ভাবে দায়ী করা যায় না। উপযুক্ত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন পরিবেশ। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য-সদৃশ পরিবেশে আর যা হোক জ্ঞান সাধনা করা যায় না। জ্ঞানের দুয়ারে ভিখারী থাকাই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। এরা না পারে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে, না পারে দেশের জন্য অবদান রাখতে। এর অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস। এই ত্রাস কেন দূর হচ্ছে না কিংবা কারা এর মদদগার তা এতো স্পষ্ট যে বলা নিরর্থক। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে ভর্তি সমস্যা, মেধা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ লাভে অসুবিধা, বৈষম্যগত কারণে মনস্তাত্ত্বিক সংকট এবং অনকূল পরিবেশের অভাব শিক্ষাক্ষেত্র সংকটগ্রস্ত করে রেখেছে। এর প্রতিকার করার জন্য উপরোক্ত সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যা দূর করা প্রয়োজন। এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা দরকার যাতে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে পড়াশুনা করা সম্ভব হয়। তা না হলে শুধু শিক্ষার্থীর জীবন নয়—জাতীয় জীবন হতেও অন্ধকার দূর হবে না। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় ভুলে যাওয়া দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীনতার ২৫তম বর্ষেও শিক্ষিতের হার শতকরা ২৭-বা ৩০ জন মাত্র। একই সময়ে স্বাধীন অন্যান্য দেশের অবস্থা এর চেয়ে অনেক উন্নত। ইহা শ্লাঘার বিষয় হতে পারে না।